DEPARTMENT OF BENGALI

ADHUNIK KABITA

SEM-4 (HONS.), CC-8

DR.SWAPNA DAS

BANALATA SEN

"বনলতা সেন" কবিতাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু তার কবিতা পত্রিকায়। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত কবিতার পৌষ, ১৩৪২ সংখ্যার মাধ্যমে বনলতা সেন সর্বপ্রথম পাঠকের হাতে এসে পৌঁছায়। জীবনানন্দ দাশ বাংলা ১৩৪৯, ইংরেজি ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তার বনলতা সেন নামক তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেন। কবিতা-ভবন কর্তৃক প্রকাশিত "এক পয়সায় একটি" গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে। প্রকাশক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ নিজেই। ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মোট ১২টি। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন শম্ভু সাহা।[১] পরবর্তীকালে জীবনানন্দ দাশ ১৯৪৪ এ প্রকাশিত তার চতুর্থ কাব্য মহাপৃথিবীতে উক্ত বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতাই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ ‘‘মহাপৃথিবী’’ কাব্যগ্রন্থেরও প্রথম কবিতা ছিল ’বনলতা সেন’□

কবির জীবদ্দশায় বাংলা শ্রাবণ, ১৩৫৯, ইংরেজি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে **বনলতা সেন** কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। ৪৯ পৃষ্ঠার বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত সংস্করণে আগের ১২টি কবিতার সাথে আরও ১৮টি কবিতা যোগ করে মোট ৩০টি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন সত্যজিৎ রায় ও মূল্য ছিল ২ টাকা। সিগনেট সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত।[১] পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটিতেও কবিতাটি সংকলিত হয়। এছাড়া আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *আধুনিক বাঙলা কবিতা*শীর্ষক গ্রন্থেও কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছিল। কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ চিহ্নিত ৮ নং খাতায় এ কবিতাটি আছে। তাই, পাণ্ডুলিপির হিসেবে, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*]

কবিতাটি প্রকাশের সময় সিটি কলেজে টিউটরের চাকুরি হারিয়ে বেকার জীবনানন্দ সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কোলকাতায় দিনাতিপাত করছিলেন। এ ঘটনার মাত্র কয়েক বৎসর আগে তার বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রীর সাথে বনিবনা হবে না কোনোদিন তা ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*]

কবিতাটির সঠিক পাঠ নিয়ে প্রশ্ন আছে; কেননা ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। যদিও সে সবের পার্থক্য ব্যাপক কিছু নয়। তবে ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির কবিতা শীর্ষক গ্রন্থের পাঠটি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়।[*তথ্যসূত্র প্রয়োজন*]

শিরোনাম[উৎস সম্পাদনা]

আপাত দৃষ্টিতে 'বনলতা সেন' একটি প্রেমের কবিতা যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বনলতা সেন নাম্নী কোনো এক রমণীর স্মৃতি রোমন্থন। শুরু থেকেই পাঠকের কৌতূহল বনলতা সেন কী বাস্তবের কোনো নারী নাকি সম্পূর্ণ কল্পিত একটি কাব্যচরিত্র। এ কবিতার তিনটি স্তবকের প্রতিটির শেষ চরণে বনলতা সেন নামের এক নারীর উল্লেখ আছে।

> প্রথম স্তবকের শেষ চরণ : "আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন";
> দ্বিতীয় স্তবকের শেষ চরণ : "পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন"; এবং
> তৃতীয় স্তবকের শেষ চরণ : "থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"

বনলতা সেন ছাড়াও জীবনানন্দের কাব্যে বেশ কিছু নারী চরিত্রের উপস্থিতি আছে; যেমন শ্যামলী, সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সরোজনী, শেফালিকা বোস, সুজাতা ও অমিতা সেন। তবে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অন্তরালবাসী কারুবাসনা নামীয় উপন্যাসে প্রথম 'বনলতা সেন' নামটি পাওয়া যায় অধিকন্তু 'হাজার বছর ধরে খেলা করে', 'একটি পুরোনো কবিতা' এবং 'বাঙালি পাঞ্জাবী মারাঠি গুজরাটি' শীর্ষক আরও তিনটি কবিতায় এ নামটি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে *কারুবাসনা* উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে, কবির মৃত্যুর বহুকাল পর। এর ভাষা-ভঙ্গিতে অনবগুণ্ঠিত আত্মজৈবনিকতা সেকালের পাঠক মনে বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল। বনলতা সেন রক্ত মাংসের কোনও মানবী না-কি নিছকই কল্পিত কোনও কবিতাশ্রিত নারী এ প্রশ্নটি অবসিত না-হলেও রহস্যের কিনারা হয়েছে কিছু। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি উদ্ধারক ডা. ভূমেন্দ গুহ কবির 'লিটেরেরি নোটস' গবেষণা করে জানিয়েছেন যে কবির জীবনে প্রেম এসেছিল সন্দেহ নেই। দিনলিপি বা লিটেরেরি নোটস-এ ওয়াই (Y) হিসেবে উল্লিখিত মেয়েটিই কবির কাঙ্ক্ষিত নারী। বাস্তবে সে শোভনা - কবির এক কাকা অতুলান্ত দাশের মেয়ে -- যার ঘরোয়া নাম বেবী। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে লাবণ্য দাশকে বিয়ের আগেই এই বালিকার প্রতি যুবক জীবনানন্দ গভীর অনুরাগ অনুভব করেছিলেন। একটি উপন্যাসে শচী নামেও একে দেখতে পাওয়া যায়। শোভনাকে নিয়ে জীবনানন্দের অনুরাগ উন্নীত হয়েছে অনুক্ত প্রেমে; লাবণ্য দাশের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন আদৌ সুখকর না-হওয়ায় এই প্রেম তীব্রতর হয়ে ক্রমশ এক প্রকার অভিভূতিতে পর্যবসিত হয়েছিল।

অর্থক্রম[উৎস সম্পাদনা]

কবিতাটির প্রথম স্তবকে হাজার বছর ব্যাপী ক্লান্তিকর এক ভ্রমণের কথা বলেছেন কবি : তিনি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে ফিরেছেন;- যার যাত্রাপথ সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর অবধি পরিব্যাপ্ত। তার উপস্থিতি ছিল বিম্বিসার অশোকের জগতে যার স্মৃতি আজ ধূসর। এমনকী আরো দূরবর্তী বিদর্ভ নগরেও স্বীয় উপস্থিতির কথা জানাচ্ছেন কবি। এই পরিব্যাপ্ত ভ্রমণ তাকে দিয়েছে অপরিসীম ক্লান্তি। এই ক্লান্তিময় অস্তিত্বের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য

শান্তির ঝলক নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বনলতা সেন নামের এক রমণী। কবি জানাচ্ছেন সে নাটোরের বনলতা সেন।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেনের আশ্চর্য নান্দনিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। বনলতা সেনকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ধকারে। তার কেশরাজি সম্পর্কে কবি লিখেছেন : "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"; মুখায়ব প্রতীয়মান হয়েছে শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো। বনলতাকে দেখে গভীর সমুদ্রে হাল-ভাঙ্গা জাহাজের দিশেহারা নাবিকের উদ্ধারলাভের অনুভূতি হয়েছে কবির, যেন একটি সবুজ ঘাসের দারুচিনি দ্বীপ সহসা ঐ নাবিকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বনলতা সেনও তার পাখির নীড়ের মতো আশ্রয়ময় চোখ দুটি তুলে জানতে চেয়েছে, "এতদিন কোথায় ছিলেন?"

তৃতীয় স্তবকটি স্তগতোক্তির মতো মৃদু উচ্চারণে একটি স্বপ্ন-উন্মোচনের কথা শোনা যায়। কবি জানাচ্ছেন (হেমন্তের) দিন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যা আসে, ধীরে, ধীরলয়ে শিশিরপাতের টুপটাপ শব্দের মতো। তখন (দিনভর আকাশচারী) চিলের ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে যায়। এ সময় পাখিদের ঘরে ফিরে আসার তাড়া; এসময় (যেন) সব নদীরও ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা। পৃথিবীর সব আলো মুছে যায়; অন্ধকারে কেবল কয়েকটি জোনাকি জ্বলে। সারাদিনের জাগতিক সব লেনদেন সমাপ্ত হয়েছে; গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরি; তখন (কেবল) অন্ধকারে বনলতা সেনের মুখোমুখি বসে গল্প করার অবসর।

সাহিত্যালোচনা[উৎস সম্পাদনা]

'বনলতা সেন' কবিতাটি সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক পঠিত বাংলা কবিতাগুলোর একটি। জীবনানন্দের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার বেশ আগেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ শেষ দিককার কবিতায় যে দুর্গম সান্ধ্যভাষা পরিলক্ষিত হয় এ কবিতায়ও তা অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এমনই এক দুর্মর রোমান্টিকতা কবিতাটির অবয়বে পরিব্যাপ্ত যা পাঠককে সহজে আচ্ছন্ন করে; ফলে কবিতাটির আন্তর্ভাষ্য নিয়ে চিন্তার প্রণোদনা পাঠকের হৃদয়ে সহজে প্রশ্রয় লাভ করে না। সাধারণ পাঠকের কাছে এটি নিছকই একটি প্রেমের কবিতা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে; অথচ এর মর্মমূলে রয়েছে সুগভীর ঐতিহাসিকতা।

এলান পো'র টু হেলেন এর সঙ্গে সাযুজ্য[উৎস সম্পাদনা]

এ কবিতাটির বিভিন্ন আলোচনায় বলা হয়েছে যে এডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' (বাংলাঃ হেলেনের প্রতি) কবিতাটির সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে জীবনানন্দ দাশ এই কবিতাটি পড়ে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে 'বনলতা সেন' এবং 'টু হেলেন'-এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ[উৎস সম্পাদনা]

সেই পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি নানা হাতে ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি বহুবার অনূদিত হয়েছে। প্রথম অনুবাদটি করেছিলেন মার্টিন কার্কম্যান, যা একটি কবিতা

সংকলনে গৃহীত হয়েছিল। অব্যবহিত পরেই কবি নিজে করেছেন এর অনুবাদ। আরও যাদের হাতে কবিতাটি অনূদিত হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সনৎ ভট্টাচার্য, পুরুষোত্তম লাল ও শ্যামশ্রী দেবী, ম্যারি ল্যাগো (তরুণ গুপ্তর সহযোগে), চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হায়াৎ সাইফ, মুকুল শর্মা, ক্লিনটন সিলি, আনন্দ লাল, সুকান্ত চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, অনুপম ব্যানার্জি, অঞ্জন বসু, ফখরুল আলম, জো উইন্টার, অরুণ সরকার, ডি কে ব্যানার্জি, অমিতাভ মুখার্জি এবং জয়দেব ভট্টাচার্য। অনুবাদগুলো পাঠ করলে অনুবাদকদের উপলব্ধির প্রভেদ এবং মর্মার্থ অনুধাবনে ভিন্নতা প্রতিভাসিত হয়। সুজিত মুখার্জি তার *ট্রান্সলেশন এজ ডিসকভারী*(১৯৯৪) শীর্ষক গ্রন্থে ৬টি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২] জীবনানন্দ দাশ মার্টিন কার্কম্যানকৃত অনুবাদে "পাখির নীড়ের মতো চোখ" কথাটির আক্ষরিক অনুবাদে আপত্তি জানিয়েছিলেন। অধিকাংশ অনুবাদক প্রথম ছত্রের ("হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে") হাজার বছর ব্যাপী পথ চলাকে ঘটমান বর্তমান কাল হিসেবে অনুবাদ করেননি। তৃতীয় স্তবকের দুটি লাইন "পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন / তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল" এর মর্মার্থ রূপায়নে সক্ষম হননি অনেক অনুবাদক।

জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন':

বনলতা সেন কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪২/ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে। কবিতাটি তৎকালীন ‘কবিতা’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়, সে সময় কবিতা’র সম্পাদক ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে দেখা যায়, কবিতাটি লেখা হয়েছিলো ১৯৩৪ সনে। সিটি কলেজের সহকারী লেকচারারের চাকরি হারানো সত্ত্বেও কবি তখন কলকাতায় বাস করছেন। জীবনানন্দ রুল করা এক্সারসাইজ খাতায় লিখতেন। কবিতাটি আট নম্বর খাতার (কবি নিজেই সেই খাতাগুলোকে ১,২,৩ করে নম্বর দিয়ে রাখতেন) ২৪ তম পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে , ' এতোদিন কোথায় ছিলেন?'

পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে--সব নদী--ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কবিতার মূল ভাবটিকে অনেকে ১৮৩১ সালে লেখা এডগার এলেন পো'র টু হেলেন কবিতার সাথে তুলনা করেন, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে ভাবতে ভালবাসেন। যারা পো'র নাম শুনেননি বা ইংরেজি কবিতার প্রতি আগ্রহ কম, তাদের একটি তথ্য জানিয়ে রাখি হলিউডের জনপ্রিয় নায়ক টম হ্যাঙ্কস দি লেডিকিলার মুভিতে এই কবিতাংশ আবৃত্তি করেছিলেন।

কবিতা হিসেবে কেন গুরুত্বপূর্ণ

বনলতা সেন কবিতাটিকে বাংলা কবিতায় একটি নতুন যুগ এনে দেয়া কবিতা বলা হয় কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে কল্লোলযুগের পাঁচ কবি যে আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন তার যোগ্যতম প্রতিনিধি এই কবিতাখানি। অথচ এই কবিতায় কোন বিদ্রোহ নেই, সদম্ভ উচ্চারণ নেই, নিজের অনন্যতা ঘোষনা করবার কোন সূক্ষ্ম প্রচেষ্টাও নেই। কবিতাটির বুনোট অত্যন্ত নিবিড়, রোমান্টিকতার মোড়কে কবি পুরো মানবসভ্যতার পরিভ্রমণ আর গন্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনটি স্তবকের আঠারোটি লাইনের মাধ্যমে। কবিতাটি পাঠে মনোরম, শব্দচয়নে ঐতিহ্যনির্ভর, ভাবে মিলনোন্মুখ। হাজার হাজার বছরের অবিরাম সন্ধান শেষে 'বনলতা সেন'রূপী নারী অথবা প্রকৃতির কাছে মানবসভ্যতার স্বস্তিময় আত্মসমর্পণই কবিতার মূল সুর হিসেবে বেশিরভাগ পাঠকের কাছে বেজে ওঠে।

'বনলতা' কে ছিলেন

বনলতা সেনের চুলকে তুলনা করা হয়েছে বিদিশা নগরীর আঁধারের রহস্যময়তার সাথে, মুখশ্রীকে তুলনা করা হয়েছে শ্রাবস্তী' র কালজয়ী শিল্প উপাদান হিসেবে। বনলতা'র চোখ পাখির নীড়ের মতো আশ্রয়দাত্রী, ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়া। মধ্যযুগের শিল্প-ঐশ্বর্য্যের ধারক বিদিশা'র অমোঘ আকর্ষণের মতো তার চুলের নেশা, শ্রাবস্তীর হাজারো স্থাপত্য আর লাখো শিল্পীর সযত্ন-মনসিজ মুখচ্ছবির মতো তার রূপ। সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদ পেছনে ফেলে পাখি যেমন সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে তৃপ্তি পায়, বনলতা'র চোখ তেমনি।

কবি নির্মিত এই অপার্থিব নারীর অবয়ব নির্মাণে মাটির পৃথিবীর কোন নারী রসদ জুগিয়েছে তার রহস্য অনেকেই জানতে চান। সত্যিকারের 'বনলতা কে?' তা নিয়ে নানা ধরণের মতবাদ এসেছে।

১। কেউ কেউ মনে করেন (আমি এই দলের) বনলতা সেন নামটির ভেতর তার পরিচয় লুকিয়ে আছে। নামটির দু'টি অংশ বনলতা আর সেন। বনলতা প্রকৃতি আর সেন নারী। জন্মলগ্ন থেকেই মানবজাতি নারী আর প্রকৃতির কাছেই একমাত্র শান্তি খুঁজে পেয়েছে কবির মূল বক্তব্য এটিই। এই বিষয়টি স্পষ্ট করতেই কবি এই নামটি বেছে নিয়েছেন, সমসাময়িক আধুনিক নারীর নামের সাথে সাদৃশ্য রেখে কবি তার স্বভাবজাত রোমান্টিকতার আড়াল তৈরি করেছেন মাত্র।

২। বিশিষ্ট আমলা আকবর আলী খান তার 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' বইয়ে বনলতা সেনের 'সেন' উপাধি আর তার বাসস্থান নাটোর এই দুইয়ের সংযোগে আরেকটি ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। ইনার ব্যাখ্যাটিও যথেষ্ট কনভিন্সিং। আকবর আলী খানের মতে 'নাটোর' শব্দটির ব্যবহার শুধু বনলতা সেনের ঠিকানা নির্দিষ্ট করতে নয়, তার পেশা নির্দিষ্ট করতেও। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যায় এ শতাব্দীর প্রথমদিকে নাটোর কাঁচাগোল্লার জন্য নয়, বিখ্যাত ছিলো রূপোপজীবিনীদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে। 'সেন' শব্দটি তার বংশের পরিচয় বহন করছে, পেশা গ্রহণ করবার পর 'বনলতা' নামের আড়ালে সে তার নিজের আসল নাম গোপন করেছে। 'দু'দণ্ড শান্তি' কথাটির মূল অর্থ আদিম অভিসার, 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রশ্নটি এই হাহাকার প্রকাশ করে যে, কবিতার 'আমি' আগে দেখা দিলে, বনলতা রূপাজীবা'র পেশাটি গ্রহণ করতেন না। দুঃসময়ে কেন পাশে ছিলেন না, এই হাহাকার বনলতার বুক জুড়ে। আর এই কবিতায় আরোপিত 'অন্ধকার' বলে দেয়, বনলতা সেন'দের আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে পাওয়ার সুযোগ নেই। 'অন্ধকারে মুখোমুখি বসবার' স্মৃতিটুকু সাথে নিয়ে পাখির মতোই ঘরে ফিরে যেতে হয়; যেখানে অপেক্ষা করে সাধারণ নারী'□

৩। কিছুদিন আগে জীবনানন্দের ডায়েরির প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছে কলকাতায়। ভূমেন্দ্র গুহের কাছে জীবনানন্দের ডায়েরি রাখা আছে। সেই ডায়েরিতে লিটারেরি নোটস্ হিসেবে Y নামে এক মেয়ের নাম লেখা আছে। জীবনানন্দ তার নিজের হস্তাক্ষরে লিখে রেখেছেন Y=শচী; এই 'শচী' জীবনানন্দের গল্প 'গ্রাম ও শহরের গল্প'র শচী। ডায়েরির অন্যান্য পৃষ্ঠা বিবেচনায় ভূমেন্দ্র গুহ বলেছেন, জীবনানন্দের চাচাতো বোন শোভনার প্রতি কবি দূর্বল ছিলেন। এই শোভনাই হচ্ছেন ওয়াই বা শচী বা বনলতা সেন। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' কবি এই শোভনা মজুমদারকে উৎসর্গ করেছেন। কবি হিসেবে উপেক্ষার অনেক কঠিন সময়গুলিতে জীবনানন্দের কবিতার মুগ্ধ পাঠিকা ছিলেন শোভনা, দরজা বন্ধ করে প্রায়ই কবি শোভনাকে কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। অর্থাৎ ভূমেন্দ্র গুহের বিবেচনায় বনলতা সেন নিখাদ প্রেমের কবিতা।

৪। বনলতা সেন রচনার পচাত্তর বছর পূর্তিতে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অশোক মিত্র জানাচ্ছেন তিনি নিজে কবি জীবনানন্দ দাশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এই 'বনলতা সেন' কে? কবি বনলতা সেন কে এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব দেন নি। শুধু বলেছেন, বনলতা সেন নামটি কবি পেয়েছিলেন পত্রিকা থেকে। সে সময় নিবর্তক আইনে বনলতা সেন নামে এক একজন রাজশাহী জেলে বন্দিনী ছিলেন। সেখান থেকেই কবি এই নামটি গ্রহণ করেন। এই বনলতা সেন পরে কলকাতার কলেজে গণিতের শিক্ষকতা করতেন।

কবিতার ব্যাখ্যা

জীবনানন্দের কবিতার ব্যাখ্যা নিয়ে তার জীবিত থাকাকালেই ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে অনেক। একদল তার কবিতা নিয়ে করেছেন হাসি তামাশা আরেকদল করেছেন অতি প্রশংসা। অতি প্রশংসাকারীরা জীবনানন্দের কবিতাকে ছাঁচের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি অতি সাধারণ ধারণা দাঁড়িয়েছে। এর একটি হলো, জীবনানন্দের কবিতার কৃতিত্ব তার বাণীর মহিমায় নয় বরং এর রচনা শৈলী আর চিত্ররূপময়তায়। তার কবিতা নিয়ে অভিযোগ আছে এতে কোনো দর্শন নেই কেবল রূপক আর উপমার ছটা। তাই জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে কেউ মন্তব্য করেছেন, *"পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির মতো তার কাব্য কুহেলি কুহকে আচ্ছন্ন।"*
কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে জীবনানন্দ নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তার কবিতা নিয়ে ধারণা বদলে যাচ্ছে। কবিতার প্রতিটি শব্দ আর বাক্যের ভেতরে যে নিগুঢ় ইঙ্গিত আছে তা খুঁজে বের করছেন গবেষকরা। জীবনানন্দ যেমন নিখুঁত ভাস্করের মতো পাথর কেটে অপরূপ সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করেছেন ঠিক সেভাবে গবেষকেরা তার মূর্তিকে কাঁটাছেড়া করে এর পেছনের সত্য উদঘাটনে নেমেছিলেন।

বনলতা সেন কবিতায় এক নায়ক কিংবা পথিকের হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটার কথা বলা হচ্ছে, সেই হাঁটার অতি সাধারণ ব্যাখ্যা ছিল হাজার বছর ধরে প্রেমিকরূপী এক পথিক তার প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কবিতায় একটু পরেই আবার বলা হচ্ছে 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'□ প্রেমের পথে হেঁটে ক্লান্ত কেন প্রেমিক?তাই ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রেমিক নয় বরং এক জন্ম জন্মান্তরের পথে ঘুরে বেড়ানো এক ক্লান্ত মানুষ। সেই ক্লান্ত মানুষের যাত্রা নিশীথের অন্ধকারে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে। কিন্তু ভূগোল বাধিয়েছে বিপত্তি, সিংহল সমুদ্র কিংবা মালয় সাগর নামে কোনো সাগর কিংবা উপসাগরের অস্বিত্ব মানচিত্রে নেই। তবে সিংহল নামে একটি দ্বীপ আর মালয় উপদ্বীপের অস্তিত্ব আছে। তাই ধারণা করে নেওয়া হয়েছে কবি ঐ এলাকার আশেপাশের সামুদ্রিক এলাকাকেই বুঝিয়েছেন।পথ হাঁটার কথা যেহেতু বলেছেন সেহেতু এর তটরেখা ধরেই হাঁটতে হবে, আর সেই তটরেখা ভীষণরকমের সর্পিল আর বিপদসংকুল। ঠিক আমাদের জীবনের পদে পদে আমরা যেমন বিপদসংকুল পথ পাড়ি দেই, তার রূপায়ন করেছেন কবি তার কবিতায়। আর জীবনের পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে আমরা খোঁজ করি শান্তির, নির্বাণের।

ভাববনলতাকে খুঁজে পাওয়া আসলেই অনেক কঠিন করে দিয়েছেন কবি। কবিতার প্রতিটি অনুচ্ছেদে 'অন্ধকার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বনলতার সাথেও কবির দেখা হয় অন্ধকারেই। কোনো কোনো গবেষক বলেছেন, এই অন্ধকার নিজেকেই চিনতে না পারার অন্ধকার। নির্বাণ বা মুক্তি লাভের আগপর্যন্ত এই অন্ধকার থেকে মুক্তি নেই। অনেকেই এই কবিতায় বৌদ্ধ দর্শনের বেশ প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। তাই এই অন্ধকারকে নিজে চিনতে না পারার কিংবা পাপের অন্ধকার হিসেবেই আখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষকরা।

বনলতা সেন কবিতায় দুই প্রাচীন প্রভাবশালী রাজার নাম পাওয়া যায়। এদের একজন মগধের অধিপতি বিম্বিসার আরেকজন মৌর্য সম্রাট অশোক। দুইজনই জীবদ্দশায় বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। একজন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে হয়েছিলেন পাপের শিকার, অন্যজন পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করতে। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। তাই সিংহাসন দখল করে বাবা বিম্বিসারকে কারাগারের অন্ধকারে ঠেলে দেন। সেখানে অনাহারে মারা যায় বিম্বিসার। অন্যদিকে নিজের লোভ আর লালসায় কাবু হয়ে অশোক যুদ্ধ বাঁধিয়েছিলেন। কিন্তু 'কলিঙ্গ' যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে পাষণ্ড অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাই একদিকে পাপের শিকার বিম্বিসার অন্যদিকে অনুতপ্ত পাপী অশোককে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তার কবিতায়। বনলতা সেন কবিতার ব্যাখ্যায় দীর্ঘদিন এই দুই রাজার নামকে প্রাচীনযুগের নিদর্শন হিসেবে নেওয়া হতো। এর গভীরে যে পাপবোধ আর গ্লানির ইতিহাস চাপা পড়ে আছে সেটি অবহেলিতই ছিল।

কবিতার আরো গভীরে এসেছে দু'দণ্ড শান্তির কথা, দু'দণ্ডের শান্তি দিয়ে কবি হয়তো এক ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের কথা নির্দেশ করেছেন। এরপর বনলতার চুলের সৌন্দর্যের উপমা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা’ বিদিশার নিশা কি শুধুই বনলতার চুলের সৌন্দর্যের উপমায় ব্যবহার করা হয়েছে? নাকি এরও গুঢ় অর্থ রয়েছে?কালিদাসের মেঘদূত-এ আছে এই প্রশ্নের উত্তর। খুব ছোটবেলা থেকেই কালীদাসের রচনাবলি পড়া শুরু করেছিলেন জীবনানন্দ। আর একটু তলিয়ে দেখলেি জানা যায় মেঘদূতে প্রাচীন ভারতের এই বিদিশা নগরীকে উপস্থাপন করা হয়েছে সকল পাপাচারের কেন্দ্র হিসেবে। পেশাদার পতিতাদের আশ্রয়স্থল হিসেবেও এই নগরীকে দেখানো হয়েছে মেঘদূতে।

তবে বনলতা নামটির উৎস কোথায় তা নিয়ে কবিকে জীবদ্দশায় প্রশ্ন করেছিলেন অশোক মিত্র। জীবনানন্দ তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, ১৯৩২ সালের আশেপাশে আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘বনলতা সেন’ নামে এক বন্দীর খবর ছাপা হয়েছিল, সেই খবরটি তিনি পড়েছিলেন, নামটিও সেখান থেকেই।বনলতার নামের সাথে কবিতায় একটি শহরের নাম উতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেটি হল নাটোর। এমনকি কবি নিজে 'বনলতা সেন' কবিতার ইংরেজি অনুবাদে 'Banalata Sen of Natore' লিখেছেন।তবে উত্তরবঙ্গের এই শহরে কবি কখনো গিয়েছিলেন তার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। দিনলিপিতে না থাকলেও হয়তো ঘুরেও আসতে পারেন কোনো কালে। নাটোর শহরের আশেপাশে বড় বড় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘকাল ধরে এই শহরটি ছিল পতিতাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।

আর কবিতায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে বনলতা দেখেছেন অন্ধকারে, পাশাপাশি দিয়েছেন দুদণ্ডের শান্তি। এইসব চাবিকাঠিকে একত্রিত করে কোনো কোনো বিশ্লেষক বনলতা সেনকে ভাগ্যের সাথে লড়াইয়ে পরাজিত এক দেহপসারিনী হিসেবেই দেখিয়েছেন। বনলতা সেন কবিতায় জীবনানন্দের ব্যবহৃত বেশিরভাগ উপমাই পাপাচারের দিকে নির্দেশ করছে, নিশ্চয় কবি কাকতালীয়ভাবে এগুলোকে একত্র করেননি। এমনকি কবির দিনলিপি ঘেঁটে তার পতিতালয়ে যাবার বর্ণনাও পাওয়া যায় যদিও সেটি দিল্লীতে, নাটোরে নয়।

কবিতার একটি লাইনে আছে ‘এতদিন কোথায় ছিলেন’ এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলছেন কবিতার নায়ককে বনলতা আগে থেকেই চিনতেন, দীর্ঘ বিরতিতে দেখা হয়েছে তাই

প্রশ্ন করছে এতদিন কোথায় ছিলেন। তবে অন্য অনেকেই ব্যাখ্যা করেছেন, এই প্রশ্নের মাধ্যমে বনলতা নায়কের প্রেম প্রত্যাখ্যান করছেন। কারণ নায়ক বনলতা সেনের জীবনের আসার আগেই এমন অপ্রীতিকর কিছু ঘটে গেছে, যার ফলে তার প্রেম গ্রহণ করা আর সম্ভব নয়, শুধুমাত্রই দু'দণ্ড শান্তিই ভরসা। তাই দুঃখ আর প্রত্যাখানের সুর মিশে আছে এই প্রশ্নে। হয়তো সেই ভালবাসার নায়কের সাথে আরো আগে দেখা হলে এই পথে আসার দরকার হত না বনলতার। তবে কবি বনলতার চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'□ এই উপমায় চোখের সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি তুলে ধরা হয়েছে বনলতার চোখে দেখা ভালোবাসা আর আশ্রয়ের আশ্বাসের কথা।

কবিতার শেষ কয়েক লাইনে দেখা যায় পাখিদের নীড়ে ফেরার কথা, জীবনের সব লেনদেন ফুরিয়ে আসার কথা। বনলতা সেন কবিতার নায়কেরও হয়তো ঘর আছে, সব লেনদেন মিটিয়ে তাড়া আছে ঘরে ফিরে যাবার। কিন্তু ঘরে ফিরে গেলে কি বনলতা সেন থেকে তার মুক্তি মিলবে, নাকি এই সল্পসময়ের এক অভূতপূর্ব ভালোবাসা চিরজীবন তাড়া করে বেড়াবে নায়ককে।

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন

অন্ধকারে দুদণ্ড শান্তি দেওয়া বনলতা সেন চিরকাল নায়কের হৃদয় অধিকার করে রেখেছে, জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধনে জুড়ে আছে সেই প্রেম। তাই বনলতা সেনকে কেউ পতিতা বলে আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বলেছেন এর বাস্তব ভিত্তি নেই, এটি শুধুই একটি আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব, যার চোখে প্রেম ছিল কিন্তু দুইজন দুইজনকে কাছে চেয়েছিল কিন্তু পাওয়া হয়ে উঠেনি।

কেউ কেউ এই কবিতাকে কবির জীবনের প্রেমিকা শোভনার সাথে তুলনা দিয়েছেন। জীবনানন্দের অল্পবয়সী খুড়তুতো বোন শোভনা এবং জীবনানন্দ দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতেন। তবে সামাজিক বাঁধার কথা মাথায় রেখে এই সম্পর্ক কোনো পরিণতি পায়নি। তবে বাকিটা জীবন কবিও শোভনাকে ভুলতে পারেননি, পারিবারিক জীবনেও খুব একটা সুখী হতে পারেননি তিনি। তাই সব লেনদেন শেষ করে ক্লান্ত হয়ে কবিতার নায়কের মতোই নীড়ে ফিরে গেলেও প্রতিটি অন্ধকারই হয়তো বনলতা সেনের কথা মনে করিয়ে দেয় কবিকে বারবার। সেই বনলতা সেন কারো চোখে পতিতা, কারো চোখে না পাওয়া প্রেমিকা।